Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1 & 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত মুন্সিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রাম

(Kinship and Descent System of Malbedey Community: A Case Study of Gopalpur Village in Munshiganj District.)

কাজী মিজানুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধটিতে মুন্সিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত এবং পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থায় জ্ঞাতি এবং বংশধরদের ভূমিকা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর একটি উপশাখা হলো মালবেদে যারা অতীতে নৌকায় বসবাস এবং নদীপথে ঘুরে ঘুরে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই জনগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশা সাপধরা ও বিক্রি, কবিরাজি, কড়িমালা বিক্রি, তাবিজ বিক্রি, সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠী নৌকা জীবন ত্যাগ করে ডাঙ্গায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং তাদের অনেকেই প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে গ্রামীণ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীতেও জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীতে রক্ত, বিবাহ ও কাল্পনিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং বর্ণনামূলক পদাবলি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেককে নির্দিষ্ট করে সম্বোধন করা হয়। যেমন- মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, খালা, খালু, চাচা, চাচি, মামা,মামি, দুলা ভাই, ভাবি, ননদ, শালা, শালি, খালাতো ভাই, খালাতো বোন, চাচাতো বোন, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, মামাতো বোন, ফুফাতো ভাই, ফুফাতো বোন, ভাতিজা, ভাতিজি, ভাইগ্না ও ভাগ্নি ইত্যাদি। এছাড়া তাদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা প্রচলিত রয়েছে। এই ধারায় উত্তরাধিকার, বংশধারা, সম্পত্তি, পদবি ও মর্যাদা পিতা থেকে পুত্রের ওপর বর্তায়। উল্লেখ্য প্রবন্ধটি রচনায় নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিবিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্যের পাশাপাশি ধারণায়নের জন্য মাধ্যমিক উৎসের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

Abstract

The paper analyzes the kinship and descent system of Malbedey Community at Gopalpur village in Munshigonj District. An attempt has been made to explore the role of kin and descent in the traditional and changing life systems of the Malbedey community, in particular. Here Malbedey is a sub- branch of Bedey community

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ই-মেইল: kazimizanurr@yahoo.com

DOI:

in Bangladesh who had lived on boats travelling along the rivers for their livelihood since past. They are also a marginal group who customarily catches and sells snakes. Additionally, they are a folk healer, selling beads, amulets and a few more items. At present, the Malbedey community has come out the boat life to live permanently settling on land, and many of them have abandoned their traditional occupations to make a living through various informal economic activities in rural areas. The Malbedey community has the same kinship and descent system having extended as part of larger population. Research shows that blood, marriage, fictitious kinship and descriptive kinship terminologies do exist among the Malbedey community. In their kinship system everyone is addressed specifically in descriptive kinship terminologies like, Mother, Father, Grandfather, Grandmother, Aunt, Uncle, Cousin, Nephew, Niece and so on. Apart from this, patrilineal descent is common among them. In this section inheritance, descent, property, titles and status are passed from father to son. It should be noted that in writing the article, data have been collected through intensive fieldwork in an anthropological method which is additionally supplemented by secondary data.

ভূমিকা

বাংলাদেশে যে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে, তার মধ্যে বেদেরা অন্যতম। বেদে জনগোষ্ঠী অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাদের জীবিকার প্রয়োজনে নৌকায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় বলে প্রচলিতভাবে অনেকেই তাদেরকে 'যাযাবর' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। বেদেরা সাধারণভাবে বাদিয়া বা বাইদ্যা নামে পরিচিত (খান, ২০১১ক:৪৪৫)। এই জনগোষ্ঠী সাপের খেলা দেখিয়ে ও নানা ভেষজ ঔষুধ এবং ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আবার এদের মধ্যে অনেকে বানর খেলা ও যাদু দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এছাড়া বেদেরা সাপের কামড়ের চিকিৎসা, মাজা-কোমড়, হাত পায়ের ব্যথা নিরাময়ের জন্য সিঙ্গা লাগায় ও বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য তাবিজ বিক্রি করেন (কাজল, ২০২১)। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ (২০২১) অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯ জন মুসলিম এবং ৯০ ভাগ নিরক্ষর। বেদে পুরুষরা কর্মবিমুখ ও অলস প্রকৃতির। তবে নারীরা সাহসী ও পরিশ্রমী। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় বেদেরা বসবাস করছেন। তবে মুন্সিগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার শ্রীপুর এলাকায় অধিকাংশ বেদেরা বসবাস করেন। ধারণা করা হয়, এই জনগোষ্ঠী শরণার্থী আরাকানরাজ বল্লাস রাজার সাথে ১৬৩৮ সালে ঢাকায় প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরা প্রথমে মুন্সিগঞ্জ জেলায় (পূর্ব নাম বিক্রমপুর) বসবাস শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে (বাংলাপিডিয়া, ২০১৫)। Wise (1883) হচ্ছে সর্বপ্রথম লেখক যিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির নাম লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বেদেদের ৭টি বিভাগের কথা বলেন। এগুলো হচ্ছে–বা-বাজিয়া, বাজিকর, মাল, মীর-শিকারী, সাপুড়িয়া, সানদার এবং রাসিয়া। এদের মধ্যে মালবেদে জনগোষ্ঠী মুন্সিগঞ্জ ও সাভারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন। তাদের প্রথাগত পেশা হলো সাপ ধরা এবং বিক্রি করা, কবিরাজি, তাবিজ বিক্রি, সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। তবে এই জনগোষ্ঠী বর্তমানে প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে গ্রামীণ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে (রহমান, ২০১৪:৫৮)। মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে নৌকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করতো। কিন্তু বর্তমানে আর কোন মালবেদে

পরিবার নৌকায় বসবাস করে না। এখন তারা ডাঙ্গায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। উল্লেখ্য যে, মালবেদেরা বর্ষাকালে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ (শুকনো মৌসুমে) মাসে গোপালপুর গ্রামে চলে আসে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় তাদের মধ্যে বর্ণনামূলক পদাবলি ব্যবস্থা এবং পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান। আর এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা। এমন প্রেক্ষাপটে গবেষণা প্রবন্ধটি রচনায় মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রাম থেকে প্রত্যক্ষ নিবিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ কোনো গবেষণা পত্র এখনো রচনা হয়নি। এমন অবস্থায় এই জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা জরুরী। গবেষক মনে করেন প্রস্তাবিত অনুসন্ধান তাদের প্রথাগত এবং পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থায় জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারার ভূমিকা কী তা স্পষ্ট করবে। এই যৌক্তিকতায় বর্তমান গবেষণা পত্রে মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মালবেদেদের জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করতে করবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষিত এলাকা

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করে রচনা করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা পত্রটি বস্তুনিষ্ঠ করার প্রয়োজনে গুনগত উপাত্তের পাশাপাশি পরিমানগত উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য গবেষণায় প্রত্যক্ষ মাঠকর্মের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার শুরুতে গোপালপুর গ্রামে একটি খানা জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপ অনুযায়ী গোপালপুর গ্রামে মালবেদে খানা সংখ্যা ২৫৫টি এবং মোট বেদে সংখ্যা ১৪১৫ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ৭৩০ জন এবং নারী ৬৮৫ জন। তারপর ২৫৫টি খানা থেকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫৫ জন তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়। তন্মধ্যে ৩০ জন প্রথাগত পেশায় (১৮ জন নারী , ১২জন পুরুষ) এবং ২৫জন পরিবর্তিত পেশা অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত (১৭জন পুরুষ, ৮ জন নারী)। কাঠামোগত ও আধা-কাঠামোগত প্রশ্নমালা অনুসারে নির্বাচিত ৫৫ জন তথ্যদাতার নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মূল তথ্যদাতাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থায় জ্ঞাতি ও বংশধরদের ভূমিকা, তাদের আচার-অচরণ, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়। এবং মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই ও ক্রসচেক করার জন্য দলগত আলোচনা করা হয়। এছাড়া বেদে জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষনাকর্ম (পূর্বেকার), বই, প্রবন্ধ ও ফিচারসমূহ গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। গবেষণার মাঠকর্মটি ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারী থেকে ২০২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত করোনার কারণে বিরতি দিয়ে চলমান থাকে।

বর্তমান গবেষণার জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামকে নির্বাচন করা হয়। গবেষিত গ্রামে গৃহস্থ (বাঙালি মুসলমান), হিন্দু ও মালবেদে জনগোষ্ঠী বসবাস করে। গবেষণা অনুসন্ধানে দেখা যায়, গোপালপুর গ্রামে ১টি প্রাথমিক

বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৪টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ১টি বাজার, ১টি ক্লাব, ১টি পোস্ট অফিস ও ১টি পুকুর আছে। এখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার একবার হাট বসে। কাজীর পাগলা নামে গোপালপুর গ্রামের পাশে একটি হাইস্কুল আছে। এছাড়া মাঠকর্মে দেখা যায় মালবেদেরা বাড়িতে হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করেন। এবং বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলের ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ আছে। এমনকি তাদের অনেকের ঘরে টিভি, ফ্রিজ ও ফ্যান রয়েছে। তবে কয়েকটি ঘরে এখনও বিদ্যুত সংযোগ নেই। গোপালপুর গ্রামের বিলে বাঙালি গৃহস্তরা আমন ধান চাষ করে। এছাড়া গ্রামে আম, জাম, পেয়ারা, বড়ই, কাঠাল, কামরাঙ্গা, নারকেল ও বিভিন্ন কাঠ গাছ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মালবেদেরা মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণি, আর এ কারণে তাদের কেউ কৃষিকাজ করে না। তবে মজুরি শ্রমিক হিসেবে অনেকে কৃষি জমিতে কাজ করে। মালবেদেদের ঐতিহ্যবাহী পেশা হল সাপ ধরা এবং বিক্রি, সিঙ্গা লাগানো, কবিরাজি, কড়ি মালা ও তাবিজ বিক্রি। বর্তমানে গোপালপুর গ্রামের অনেক মালবেদে তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। যেমন: মুদি দোকান, ফলের ব্যবসা, বইয়ের দোকান, সেলুনের দোকান, কাঠ মিস্ত্রী, ফেরি করা, হোটেল ব্যবসা ও টেইলারী। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় মালবেদেরা ঈদুল আযহায় গোপালপুর গ্রামে চলে আসে এবং সকলে একত্রিত হয়ে ঈদ উদযাপন করে ও পশু কোরবানি দেয়। মজার বিষয় হল, এই সময় সাধারণত মালবেদে নারী-পুরুষের বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং নানাবিধ সমস্যা ও অপরাধ সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়।

জ্ঞাতিসম্পর্ক

জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো রক্ত, কাল্পনিক এবং সামাজিক বন্ধন। অর্থাৎ প্রকৃত, অনুমিত অথবা কাল্পনিক রক্তের সম্বন্ধ দ্বারা সম্পর্কিত ব্যক্তিসমূহ (Fox, 1967:33)। আর এই সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। নৃবিজ্ঞানী Radcliffe Brown (1952) আত্মীয়তার সম্পর্কের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল এবং এই সম্পর্কই গঠন করে সমাজ কাঠামো। এদিকে Majumder and Madan (1995) বলেন, সকল সমাজে মানুষ নানা সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। তম্মধ্যে সবচেয়ে প্রাথমিক ও সর্বজনীন বন্ধন হলো মানুষের জৈবিক প্রজননের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আত্মীয়তা ব্যবস্থা। আবার Crapo (2002) আত্মীয়তা সম্পর্কে বলেন, বিবাহ ও বংশানুক্রমের বন্ধনের দ্বারা সম্পর্কিত মানুষদের শ্রেণি বিভাজনের ব্যবস্থা হলো আত্মীয়তা। আত্মীয়তা সম্পর্কের দুটি দিক আছে। একটি হলো সামাজিক, অপরটি সাংস্কৃতিক। আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রধান দুটি প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়, যেমন– ১। রক্ত-সম্পর্কিত, ২। বৈবাহিক। এছাড়া Murdock (1949) বলেন, আত্মীয়তা ব্যবস্থা কোনো গোষ্ঠী ব্যবস্থা নয়, এটা হলো সম্পর্কের গাঠনিক বিন্যাস। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হয় (উদ্ধৃত, বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩:১৪৪)। মজার বিষয় হলো অনেক সংস্কৃতিতে, আত্মীয়তা সম্পর্ক, প্রজনন এবং সন্তান-পালন প্রতীক এবং বিশ্বাসের সাথে যুক্ত থাকে। আত্মীয়তা ব্যবস্থা একটি সংস্কৃতিতে প্রধানত আত্মীয় সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে উঠে এবং নানা ধরনের আচার-আচরণ জড়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৃবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, আত্মীয়তা অশিল্পায়িত এবং রাষ্ট্রহীন সংস্কৃতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ সুশৃঙ্খল নীতি। আত্মীয়তা গোষ্ঠী বিবাহ আয়োজনের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সদস্যদের নিশ্চয়তা দেয় এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং উৎপাদন, ভোগ এবং বন্টন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সদস্যদের প্রধান মৌলিক চাহিদাগুলো সরবরাহ করেন। বৃহৎ পরিসরে শিল্প সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন বিদ্যমান। তবে সামাজিক বন্ধনের অন্যান্য রূপ মানুষকে একত্রিত করে (Miller, 2007:202)। আত্মীয়তা হলো সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন। রক্ত (consanguineal) এবং বিবাহ সম্পর্কের (affinal) মাধ্যমে আত্মীয়তা গড়ে উঠে, যা মানুষকে অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার জালে যুক্ত করে। আত্মীয় সম্পর্ক সাংস্কৃতিকভাবে সংজ্ঞায়িত, যার দুটি মৌলিক কার্যাবলি রয়েছে। প্রথমত, আত্মীয় সম্পর্ক প্রজন্মের মধ্যে ধারাবাহিকতা প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তা বিশ্বের অন্যদের নির্দিষ্ট করে, যার ওপর একজন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে পারে। বিভিন্ন আত্মীয়দের শ্রেণিকরণের জন্য নির্দিষ্ট পদ রয়েছে যাকে জ্ঞাতি পদাবলি ব্যবস্থা বলা হয় (Nanda and Warms, 1997:182)।

যে শব্দ বা পদ দ্বারা কাউকে ডাকা বা সম্বোধন করা হয় তাকে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদ বলা হয়। যেমন–বাবা, মা, মামা, মামি, খালা, খালু, চাচা, চাচি ইত্যাদি। Morgan (1871) জ্ঞাতিসম্পর্কের পদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন–একটি শ্রেণিবাচক পদ, অন্যটি বর্ণনামূলক পদ। শ্রেণিবাচক পদ দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা যায় না। কারণ এটা প্রাক-একক বিবাহ পরিবার সময়কালে বিরাজমান ছিল এবং সে সময় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গঠিত হতো। ফলে একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের আত্মীয়তার সম্পর্ক চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য ছিল। তাই, জ্ঞাতি সম্পর্ককে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণির সকলকে বোঝাতে একটি পদ বা শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে মর্গান বলেছেন, ইগো (Ego) বা আমার নিজের বোন এবং আমার মায়ের বোনের কন্যারা সবাই আমার বোন; আমার নিজের ভাই এবং আমার পিতার ভাইয়ের পুত্ররা সবাই আমার ভাই। এ ব্যবস্থাকে তিনি মালয় ও তুরানীর বলে উল্লেখ করেছেন। আর বর্ণনামূলক পদ বা শব্দ দ্বারা রক্তের সম্পর্ক স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যায়। কারণ, এ পর্যায়ে যুগল বিবাহ পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। এ প্রেক্ষিতে এক বা একাধিক পদ ব্যবহার করে প্রত্যেক আত্মীয়কে নির্দিষ্ট করে সম্বোধন করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী, স্বামীর ভাই, বোন,পিতা, পিতার ভাই, বোন, পিতার ভাই ও বোনের সন্তান, মা, মায়ের ভাই, বোন, মায়ের ভাই ও বোনের সন্তান এবং স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পদ দ্বারা সম্বোধন করা যায়। এ প্রথাকে মর্গান আর্য, সেমেটিক ও উরালিয়ান পরিবারভুক্ত করেছেন (উদ্ধৃত, রহমান, ১৯৮৮:৩২৯)।

ছক ১: জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলি ব্যবস্থা

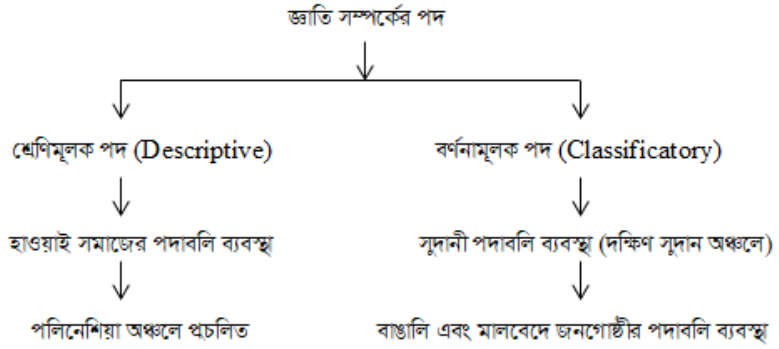

(উৎস: মর্গানের তথ্যসূত্র থেকে পরিবর্তন করে গবেষকের মাঠ-কর্মভিত্তিক তথ্য থেকে গৃহীত)

নৃবিজ্ঞানী Murdock (1949) ছয় ধরনের জ্ঞাতিবাচক পদব্যবস্থার কথা বলেন। যেমন– ১. সুদানীয় ব্যবস্থা, ২. হাওয়াইয়ান ব্যবস্থা, ৩. ইরোকুয়া ব্যবস্থা, ৪. ওমাহা ব্যবস্থা, ৫. ক্রো ব্যবস্থা, ৬. এস্কিমো ব্যবস্থা। সুদানীয় ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বর্ণনামূলক বা নির্দিষ্ট। কেননা এ ব্যবস্থায় প্রতিটি আত্মীয়কে, যেমন– মাতা, পিতা, মাতার বোন, মাতার ভাই, পিতার বোন, পিতার ভাই এবং নিজ জেনারেশনের (ইগোর) সকল আত্মীয়, যেমন–ভাই, বোন, পিতার ভাইয়ের সন্তান, পিতার বোনের সন্তান, মাতার ভাইয়ের সন্তান, মাতার বোনের সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। সুদানীয় ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয় সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। আর হাওয়াইয়ান ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শ্রেণিমূলক। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়কে পৃথক পদ দ্বারা ডাকার সুযোগ নেই। হাওয়াইয়ান ব্যবস্থায় পিতার জেনারেশনে পিতা, পিতার ভাই এবং মাতার ভাইকে একটি পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। আবার মাতা, মাতার বোন এবং পিতার বোনকে একটিমাত্র পদ দ্বারা সম্বোধন করা। নিজ জেনারেশনের বেলায় (ইগোর জেনারেশন) একই পদ আপন বোন এবং সকল মেয়ে কাজিনদের (চাচাতো, মামাতো, খালাতো) একটি পদ দ্বারা এবং আপন ভাই ও সকল পুরুষ কাজিনদের (চাচাতো, মামাতো, খালাতো) একটি পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয় (উদ্ধৃত, রহমান, ১৯৮৮:৩৩১)।

গবেষিত মুন্সিগঞ্জের হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের মালবেদেদের মাঝে প্রচলিত জ্ঞাতিসম্পর্কের পদসমূহ বৃহত্তর বাঙালি মুসলিম সমাজের বর্ণনামূলক পদব্যবস্থার অনুরূপ। মালবেদেরা বৃহৎ (মুসলিম) সমাজের মতো দাদা-দাদি, নানা-নানি, বাবা-মা, চাচা-চাচি, মামা-মামি, খালা-খালু, ভাই-বোন, ননদ, খালাতো ভাই, চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, মামাতো বোন, আপা, দুলা ভাই, শালা-শালী, ভাই, ভাবি ইত্যাদি পদাবলি ব্যবহার করেন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্ত ও বিয়ে সম্পর্কিত জ্ঞাতি ছাড়াও কাল্পনিক বা প্রথাগত জ্ঞাতি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন–উকিল বাপ, ধর্মের ভাই, সই বা বন্ধু ইত্যাদি। এই সম্পর্কগুলো অনেক সময় নিকট জ্ঞাতি থেকেও অনেক সময় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সম্প্রদায়ের কারও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে বা কেউ অসুস্থ হলে প্রথাগত আত্মীয়রা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কাল্পনিক বা প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্কে জেহাদুল করিমের গবেষণায়ও একই বিশ্লেষণ পাওয়া যায় (Karim, 1990:80)।

মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্ক খুব মজবুত। তাদের মধ্যে কেউ যদি বিপদে অথবা অসুখে পড়ে, তখন নিকট জ্ঞাতিরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। যেমন–টাকা ধার দেয় এবং অসুখ হলে সেবা করেন। উল্লেখ্য যে মালবেদে জনগোষ্ঠীর কেউ বৃহৎ সমাজ দ্বারা আক্রান্ত হলে বেদেরা সকলে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলে। অতীতে মালবেদেরা নৌকায় বসবাস করত এবং যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত। এ সময় নিকট জ্ঞাতিরা কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করত এবং বিপদ আপদে পরস্পরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। তবে বেদেদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও পেশার প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার কারণে সেবা ও সাহায্যে করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সম্ভব হয় না। বিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে মালবেদেদের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের অনুভূতি বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক সময় তাদের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কে শিথিলতা দেখা যায়।

ছক ২: মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতি-পদাবলি ব্যবস্থা

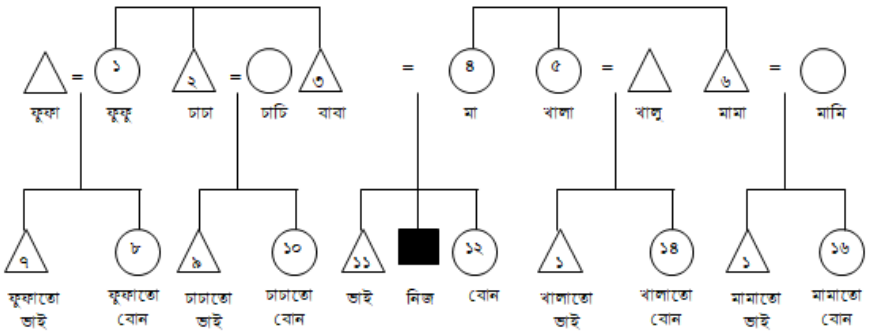

(উৎস: মাঠ-কর্ম, ২০২০-২২)

বংশধারা

বংশধারা বলতে বংশের ধারাকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে বলা হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষের সম্পর্ক দুভাবে সংগঠিত হতে পারে, হয় তাঁর বাবা অথবা তাঁর মায়ের বংশ থেকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ধারণের ধারা হতে পারে, হয় তার কন্যাসন্তান অথবা তাঁর পুত্রসন্তান থেকে। যদি পিতার বংশ থেকে বংশের ধারা বিবেচনা করা হয়, তাহলে তাকে বলে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা। আবার যদি মাতার বংশ থেকে বংশের ধারা বিবেচনা করা হয়, তাহলে তাকে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বলে (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৫৮)। বংশধারা পিতা, মাতা অথবা উভয়ের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। বংশধারা যখন পিতা অথবা মাতার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়, তখন এই গোষ্ঠীগুলোকে যথাক্রমে পিতৃসূত্রীয়, মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বলা হয়। সমষ্টিগতভাবে দুটি ধারাকে একসূত্রীয় বংশধারা বলা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজে মাতৃসূত্রীয় এবং পিতৃসূত্রীয় বংশধারা উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে যা একটি জটিল ধরনের বংশধারা তৈরি করে। যেখানে বংশধারা উভয় ধারার সঙ্গে স্বীকৃত এবং স্থায়ী। এ ধরনের বংশধারাকে কগনেটিক বলা হয়। Levi-Strauss (1969) বলেন, সকল বংশধারা ব্যবস্থার এক-তৃতীয়াংশ কগনেটিক (Cited in James Birx, 2010:180)। Fried (1967) বলেন, বংশধারা হলো একটি স্থায়ী সামাজিক ইউনিট যার সদস্যরা মনে করে তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। যদিও দলটির সদস্যপদ পরিবর্তিত হয়। যেমন–সদস্য জন্ম নেয় এবং মারা যায়, সদস্য দলে আসে এবং বের হয়। তারপরও দলটি টিকে থাকে। বংশধারার সদস্য পদ জন্মের সময় নির্ধারিত হয় এবং আজীবন সদস্য পদ বজায় থাকে। বংশের বেশিরভাগ সদস্যরা প্রায়শই অন্যান্য বংশ থেকে তাদের সঙ্গী খোঁজে (Cited in Kottak, 2004: 263)। বংশধারা হলো এক ধরনের আত্মীয়তা যেখানে একটি বংশধরের সদস্য হওয়ার মানদণ্ড হলো একটি নির্দিষ্ট বাস্তব বা পৌরাণিক পূর্বপুরুষ। বংশধারা এককভাবে পুরুষের মাধ্যমে গণনা করা যেতে পারে। এককভাবে নারীর মাধ্যমে, অথবা ব্যক্তি বিবেচনার ভিত্তিতে। কিছু ক্ষেত্রে, বংশধারা নির্ণয়ে দুটি ভিন্ন ধারা একই সময়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। আত্মীয়তার সূত্র ধরে একটি সমাজ সংগঠিত হওয়ার উপায়কে নৃবিজ্ঞানীরা বংশধারা বলে। একটি বংশধারা গোষ্ঠী হলো যে কোনো সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত সামাজিক কার্যকলাপ যার সদস্যতার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাস্তব বা পৌরাণিক পূর্বপুরুষের রৈখিক বংশধরের প্রয়োজন হয়। একটি বংশধরের সদস্যরা একটি পিতা-পুত্রের সংযোগ ধারার মাধ্যমে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষকে চিহ্নিত করেন (Haviland,

2018: 289)। আবার অন্যভাবে বলা যায় বংশধারা হলো এক বা উভয় পিতামাতার সাথে সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন। অনেক সমাজে সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তি হিসেবে বংশধর জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বংশ হলো আত্মীয়দের একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধর হিসেবে চিহ্নিত হয়। বংশ পুরুষ ধারা থেকে গঠিত হলে তাকে পিতৃবংশ বলা হয় এবং নারী ধারা থেকে গঠিত হলে মাতৃবংশ বলা হয়। পিতৃসূত্রীয় সমাজে, একজন ব্যক্তি (পুরুষ বা নারী যাই হোক না কেন) পিতা, পিতার পিতা এবং ইত্যাদি বংশধরের অন্তর্গত। এভাবে, একজন ব্যক্তি, তার বোন এবং ভাইয়ের, তার ভাইয়ের সন্তান (কিন্তু তার বোনের সন্তান নয়), তার নিজের সন্তান এবং ছেলের সন্তান (কিন্তু তার মেয়ের সন্তান নয়) সকলে একই দলের অন্তর্ভুক্ত। পিতৃসূত্রীয় সমাজে পিতা এবং স্বামী (গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো পুরুষ) আত্মীয় ব্যবস্থাকে কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। মাতৃসূত্রীয় সমাজের আত্মীয় ব্যবস্থায় একজন নারীর ভাইকে তার স্বামীর পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সন্তানদের মায়ের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত করে, পিতার নয়। এভাবে, একটি মাতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য হলো একজন মহিলা, তার ভাই এবং বোনের, তার বোনের (কিন্তু তার ভাইয়ের নয়) সন্তান, তার নিজের সন্তান এবং তার মেয়ের সন্তান (কিন্তু তার ছেলের নয়) (Nanda and Warms, 1997: 182)।

এছাড়া বংশধারা বলতে পিতামাতা ও তাদের কোনো একজন বা উভয়ের আত্মীয়দের সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সম্পর্কের ধরন এবং তাকে চিহ্নিত করার নীতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃতিভেদে তিন ধরনের বংশধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়। যেমন– ১। একপার্শ্বিক (Unilineal) ২। দ্বি-পার্শ্বিক (Bilateral) ৩। উভপার্শ্বীয় (Ambilineal)। একপার্শ্বিক নীতির ক্ষেত্রে পিতা বা মাতা যে কোনো একজনের দিকের আত্মীয়দের বিবেচনা করা হয়। আবার যেখানে উভয়দিকের আত্মীয়দের বিবেচনা করা হয় তা হল দ্বি-পার্শ্বিক। উভপার্শ্বীয় বংশধারা নীতির ক্ষেত্রে কোনো সন্তান পিতা বা মাতা উভয় দিকেরই বিবেচনা করতে পারে। তবে একই সাথে দুদিকের নয় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩ : ১৩৭)। নৃবিজ্ঞানী Fox (1967), Harris (1975), Barnouw (1982)-এর গবেষণার আলোকে বলা যায়, সংস্কৃতিভেদে তিন ধরনের বংশধারা বিরাজমান রয়েছে। যেমন– ১। একরৈখিক বংশধারা ২। দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা ৩। অন-একরৈখিক বংশধারা। একরৈখিক বংশধারা আবার দুই প্রকার। যথা–ক। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা, খ। মাতৃসূত্রীয় বংশধারা। অন-একরৈখিক বংশধারা আবার দুই প্রকার–ক। আনুষঙ্গিক, খ। দ্বিপাক্ষিক।

ছক ৩: বংশধারার ধরন

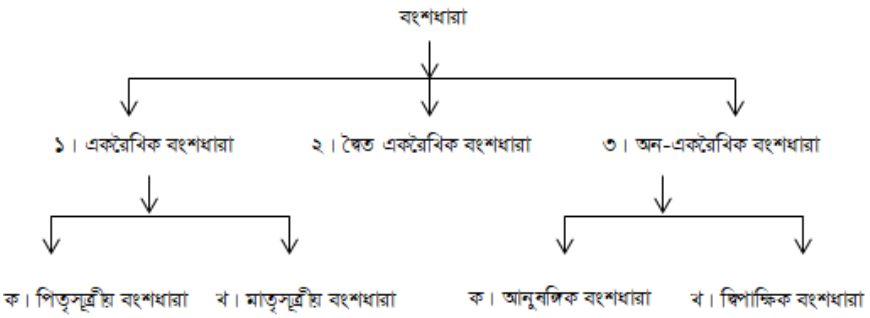

(উৎস: Fox, 1967; Harris, 1975; Barnouw, 1982 দের গবেষণা থেকে পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহীত)

বংশধারা যখন একটি লিঙ্গীয় ধারার উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, অন্যটির উপর নয়, তখন তাকে একরৈখিক বংশধারা বলে। এক রৈখিক বংশধারা দুই প্রকার, যথা–ক। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা, খ। মাতৃসূত্রীয় বংশধারা। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা হলো পূর্বপুরুষের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ণয় করা। যেমন–বাবা, বাবার বাবা, বাবার বাবার বাবা ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়, একটি পিতৃসূত্রীয় বংশের সবাই একই পূর্বপুরুষের বংশধর। যে সংস্কৃতিতে কর্তৃত্ব এবং সম্পত্তি পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা সমাজের মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এমন কিছু বংশীয় ধারা আফ্রিকার বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিদ্যমান আছে, যেখানে শুধু সমাজ নয়, রাজনৈতিক সংগঠনও বংশধারা অনুসারে গঠিত। উল্লেখ্য, এখানে চিফ বা দলনেতা অনুপস্থিত (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৬০)। নৃবিজ্ঞানী Evans- Pritchard (1940) এ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনকে নামকরণ করেছেন খণ্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন[১]। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বংশধারার ভিত্তিতে সামাজিক সংহতি এবং আনুগত্য সংগঠিত হয়ে থাকে। এটা প্রকাশিত হয় সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং শত্রুদের মোকাবিলা করার সময়। তাহলে বলা যায়, বংশধারা হলো একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদ। এ প্রেক্ষিতে নাইজেরিয়ার টিভ জাতির মধ্যে বিদ্যমান পিতৃসূত্রীয় বংশধারা কথা উল্লেখ করা যায় (উদ্ধৃত, আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৬২)। গবেষণায় দেখা যায় বেশির ভাগ সমাজে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান। শিকার সংগ্রাহক সমাজ থেকে উন্নত সমাজে এই পিতৃসূত্রীয় ধারা দেখতে পাওয়া যায়। Victor Barnouw (1982) উল্লেখ করেছেন, দক্ষিণের কিছু সমাজ বাদ দিলে গোটা ভারতে পিতৃসূত্রীয় ধারা বিরাজমান। এবং আমেরিকান ইন্ডিয়ান সিওয়ানরা এই নীতির আওতাভুক্ত। এছাড়া পূর্ব আফ্রিকার অনেক উপজাতি, ভারতের নাগা এবং নিউগিনির উপজাতিদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয় প্রথা বিদ্যমান (উদ্ধৃত, রহমান, ১৯৮৮:৩১৬)।

মাতৃসূত্রীয় বংশধারা হলো যারা একই নারীর বংশধর থেকে এসেছে। এই ব্যবস্থায় সন্তানদের মায়ের ভাইয়ের (মামা) দলে বিবেচনা করা হয়। কারণ মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা এবং মর্যাদা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। তবে তা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে, নারী বংশধরদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। মাতৃসূত্রীয় বংশধারা কিন্তু মাতৃতন্ত্র নয়; কারণ এই ব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্য রয়েছে। পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও বংশধারার সদস্য পদ অথবা সম্পত্তি পুরুষ ধারায় নির্ধারিত হয় না। এই ধারায় একজন পুরুষ সম্পত্তি পায় তার মায়ের ভাইয়ের কাছ থেকে, এবং তার সন্তানরা পায় তার স্ত্রীর ভাইয়ের কাছ থেকে। আর এ কারণেই নৃবিজ্ঞানীরা

---

১. সুদানের নুয়েরদের ট্রাইব হিসেবে কোনো কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন নেই। গোষ্ঠী বা বংশগুলো এক একটি রাজনৈতিক একক যার ভিত্তি জ্ঞাতিসম্পর্ক। নুয়েরদের মধ্যে একেসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান যা মূলত অংশিত বা খণ্ডিত। খণ্ডিত বা অংশিত গোষ্ঠী ব্যবস্থা (segmentary lineage system) হচ্ছে গোত্রের মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রতর বিভাজন। যেমন: নুয়েরদের মধ্যে ২০টির মতো গোত্র রয়েছে যার প্রত্যেকটি একাধিক গোষ্ঠীতে বিভাজিত। গোত্রে প্রথম ভাগকে ম্যাক্সিমাল গোষ্ঠী বলা হয়। এছাড়া পর্যাক্রমে রয়েছে মেজর গোষ্ঠী, মাইনর গোষ্ঠী এবং মিনিমাল গোষ্ঠী। যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর কোনো সদস্যের বিবাদ বাধে তাহলে প্রত্যেক গোষ্ঠীও এই বিবাদে সামিল হবে। অংশিত গোষ্ঠী সংগঠনে অভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একজন নাবালক সাবালক হয় এবং যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। যোদ্ধা যদি পরাজিত হয় তাহলে সমাজে সে নিচু হয়ে যায় এবং পুরুষত্বের অবসান ঘটে। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হলে বাবার সম্পদের উত্তরাধিকার এবং মর্যাদা লাভ করে (Evans- Pritchard, 1940)।

একে মাতৃতন্ত্র না বলে, ভাই অধিকার নামকরণ করেছেন। ভারতের কেরালা রাজ্যের নায়ারদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩ : ৬৩)। এদিকে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার গরোদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান। এছাড়া আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের নাভাহো, হপি, জুনি, ক্রো, ইরোকুয়া এবং হায়দা জনগোষ্ঠীতে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান। দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের টিয়ার, নায়ার ও মাপিলাদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় প্রথা বিরাজমান রয়েছে। আবার আফ্রিকার অশান্তি, টোংগো, বেমবা এবং ইন্দোনেশিয়ার মিনাং কাবাওদের মধ্যেও মাতৃসূত্রীয় বংশধারা প্রচলিত (রহমান, ১৯৮৮:৩১৭)।

পৃথিবীর সকল সমাজে বংশধারা পিতৃসূত্রীয় অথবা মাতৃসূত্রীয়ভাবে নির্ণয় করা হয় না। কিছু সমাজে দুটি একরৈখিক বংশধারা নীতি বিদ্যমান। এ ধরনের নীতিমালাকে দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা বলে। একরৈখিক এবং দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা নীতি বাদে কিছু সমাজে আরেক ধরনের বংশধারা নীতি দেখতে পাওয়া যায় তাকে অন-একরৈখিক বংশধারা বলে। অন-একরৈখিক বংশধারা আবার দুই ধরনের। যেমন–ক। আনুষঙ্গিক খ। দ্বিপাক্ষিক। আনুষঙ্গিক বংশধারা বলতে বোঝায় এমন গোষ্ঠী যাদের বংশীয় পরিচয় সমানভাবে পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে সংগঠিত হয় কিংবা দুটোর সংমিশ্রণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য আনুষঙ্গিক বংশধারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিপাক্ষিক বংশধারায় একজন ব্যক্তির (নারী বা পুরুষ) বংশ-সূত্রিতা, সকল পূর্বসূরি নারী এবং পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যে নির্ধারিত হয় (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৫৮)।

মালবেদে জনগোষ্ঠীতে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা প্রচলিত যা একরৈখিক বংশধারা ব্যবস্থা। পিতার পদবি পুত্রের উপর বর্তায় এবং বংশধারা পিতার দিক থেকে নির্ণয় হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেন এবং কন্যা বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। পিতা হলো পরিবারের প্রধান। তবে পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত নারী-পুরুষ উভয়ে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করেন।

ছক ৪: মালবেদে জনগোষ্ঠীর একরৈখিক বংশধারা ব্যবস্থা

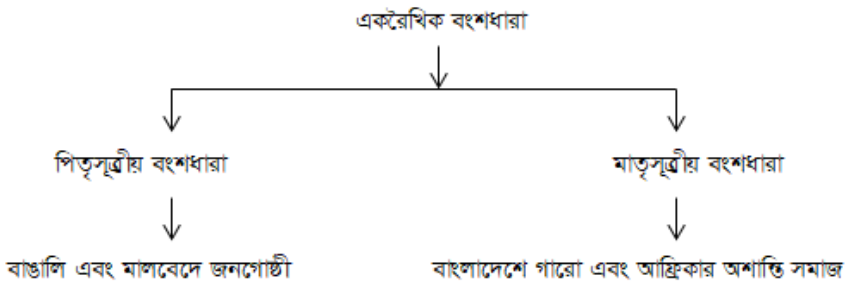

(উৎস: রহমান, ১৯৮৮; আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩ তথ্যসূত্র ও গবেষকের মাঠ-কর্মভিত্তিক তথ্য থেকে গৃহীত)

ছক ৫: মালবেদে জনগোষ্ঠীর পিতৃসূত্রীয় বংশধারা

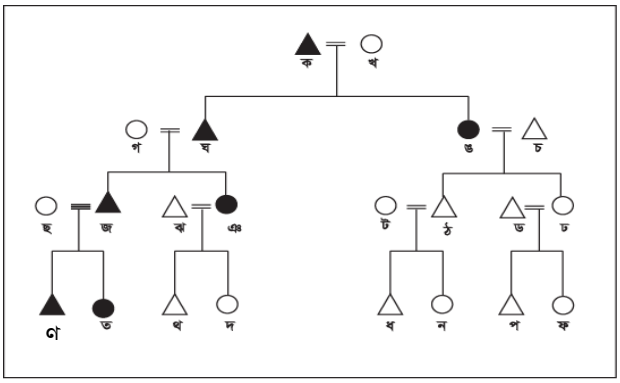

উৎস: গবেষকের মাঠকর্মের তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রনীত (মাঠকর্ম, ২০২০-২২)

ছক ৫-এর মধ্যে দেখা যায়, ঘ এবং ঙ নম্বর ব্যক্তি যারা ক এবং খ নম্বর এর সন্তান, তাঁরা তাঁদের পিতার বংশের সদস্য (কালো ভরাট চিহ্ন)। পরবর্তী প্রজন্মে গ এবং ঘ নম্বরের সন্তান ভরাট চিহ্নিত বংশের সদস্য, যেহেতু তাঁদের পূর্বপুরুষ নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের পিতার মাধ্যমে, যিনি ভরাট চিহ্নিত দলের সদস্য। তবে ঙ এবং চ নম্বরের সন্তানেরা এই পিতৃবংশের সদস্য নয়। যেহেতু তাদের বংশ-পরিচয় নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের পিতার মাধ্যমে এবং যিনি এ বংশের নয়। অর্থাৎ যদিও ঠ এবং ঢ-এর মা এই ভরাট চিহ্নিত পিতৃবংশের সদস্য, কিন্তু স্বামী (চ নম্বর) এই পিতৃবংশের সদস্য না হওয়াতে তিনি তাঁর বংশ-পরিচয় গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের সন্তানরা (ঠ এবং ঢ) তাঁদের পিতার বংশের সদস্য। চতুর্থ প্রজন্মে কেবল ণ এবং ত হচ্ছে ভরাট চিহ্নিত পিতৃবংশের সদস্য যেহেতু তাঁদের পিতা ভরাট চিহ্নিত পিতৃবংশের পূর্ব প্রজন্মের একমাত্র পুরুষ সদস্য। তাহলে এই ছকে ক, ঘ, ঙ, জ, ঞ, ণ এবং ত পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য, অপর সকল সদস্য অন্য পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য।

গবেষণা ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অতীতকাল থেকে মালবেদে সমাজে বংশের উত্তরাধিকার, মর্যাদা ও পদবি পিতা থেকে সন্তানের নিকট স্থানান্তরিত হয়। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় একমাত্র পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তান পিতার কোন সম্পত্তি পায় না। তবে পিতা যদি জীবিত অবস্থায় তার কন্যাকে সম্পত্তি লিখে দেয়, তাহলে সে সম্পত্তি পায়। সাধারণত পিতা তার কন্যাকে সম্পত্তি লিখে দেয় না। আবার পিতার মৃত্যুর পর ভাইরা যদি দয়া করে সম্পত্তি প্রদান করে তাহলে বোন তার পিতার সম্পত্তি পায়। তবে পিতার সম্পত্তি বেদে সমাজে কন্যা দাবী করতে পারেনা। অতীতে বেদেরা যখন নৌকায় বসবাস করতো তখন তাদের কোন জমি ছিল না। সম্পতি বলতে যা ছিল তা হলো নগদ কিছু টাকা, স্বর্ণ, নৌকা, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি। পিতা মারা গেলে তার ছেলে সন্তানরা উত্তরাধিকারসূত্রে উল্লেখিত সম্পত্তি ভোগ দখল করে। এক্ষেত্রে কন্যা সন্তান পিতার কোন সম্পত্তি ভোগ করতে পারে না। বাবা মারা গেলে অভিভাবক হয় পরিবারের বড় সন্তান। তবে সম্পত্তি বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত আচারে খরচ নির্বাহের পর যা থাকে প্রত্যেক ভাই নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে নেয়। উল্লেখ্য যে মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে কণে পন প্রথা বিদ্যমান আছে। আর কণে পন পায় কন্যার বাবা। আর বাবা না থাকলে কণে পন কন্যার ভাইয়েরা পায়। আবার বর্তমানে জমি ক্রয় করে ডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে বাবার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেরা পায়। কন্যা সন্তান কোন জমি পায় না। অর্থাৎ অতীত-বর্তমান কোন সময়ই কন্যা সন্তান তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না। এছাড়া মালবেদে সমাজে সর্দারের

ছেলে সর্দার হয়। সর্দারের ছেলে না থাকলে তার ভাইয়ের ছেলে সর্দার হয়। মেয়েরা কোন সময় সর্দার হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে যখন নৌকায় বসবাস করতো, তখন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত ছিল। আর বর্তমানে নৌকা ত্যাগ করে ডাঙ্গায় বসবাস শুরু করার পর থেকে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, অতীতে প্রথাগত পেশার প্রয়োজনে তারা দলবেধে বংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো। আর এই প্রথাগত পেশার কৌশল তারা নিকট জ্ঞাতি ও নিজ বংশ থেকে শিখে থাকে। মজার বিষয় হলো, এ সময় তারা বিশেষ করে নিকট আত্মীয়রা একসাথে পাশাপাশি নৌকায় বসবাস করতো। এবং বিপদ-আপদ হলে একে অন্যকে টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা টাকা-পয়সা ঋণ হিসেবে দিতো। তবে ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে দিতো। কিন্তু কেউ যদি ঋণ গ্রহণ করে মারা যায়, তাহলে তার ছেলেরা ঋণের টাকা পরিশোধ করে দেয়। আর যদি একান্তই ঋণের টাকা পরিশোধ না পারে; তাহলে মাপ করে দেয়। আর বর্তমানে ডাঙ্গায় বসবাস করার পর পরিবর্তিত পেশার প্রয়োজনে তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এবং তাদের মধ্যে দলগত চেতনার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বিকাশ ঘটেছে। ফলে বেশির ভাগ পরিবার তাদের ছেলে-মেয়ে ও সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তারপরও বর্তমানে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট আছে। কিন্তু অতীতের মতো মজবুত নয়। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় অতীতে তাদের কোন জমি না থাকায় ব্যাংক তাদের ঋণ দিতো না। ফলে ধার নেওয়ার একমাত্র অবলম্বন ছিল নিকট আত্মীয়। আর বর্তমানে ডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে করেন। ফলে অতীতের মতো অসুখ-বিসুখে সব সময় আত্মীয়ের স্মরণাপন্ন না হয়ে ব্যাংকে জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করেন। এছাড়া বর্তমানে তারা নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে অস্বস্তিবোধ করে। কারণ সমাজ এটাকে ভালো চোখে দেখে না এবং অনেক সময় লজ্জা দেয়। এই জন্য তারা ঋণ সহজে নিতে চায় না। মাঠকর্মের সময় আদিল নামে একজন তথ্যদাতা বলেন, অতীতে ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন বিপদে-আপদে ঝাপিয়ে পড়তো, কিন্তু বর্তমানে ১০০ জনের মধ্যে ২০ জন এগিয়ে আসে। অতীতে নিকট আত্মীয়ের কারও সাথে অন্য বংশের ঝগড়া-বিবাদ হলে ন্যায়-অন্যায়ের কথা চিন্তা না করে এগিয়ে আসতো। কিন্তু বর্তমানে নিকট আত্মীয়ের কেউ অন্যায় করলে বিচার বিশ্লেষণ করে পক্ষ অবলম্বন করে থাকে।

মাঠকর্ম তথ্য মতে, বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর কেউ তার জমি বিক্রি করতে চাইলে প্রথমে তার বংশের নিকট জ্ঞাতির কাছে অনুমতি বা জিজ্ঞাস করতে হয়। যেমন : আপনি আমার এই জমি ক্রয় করবেন? তিনি ক্রয় করতে অস্বীকার করলে; তখন বংশের বাইরের কারো কাছে বিক্রি করা যায়। তবে এ সম্পর্কে নজরুল বেদে বলেন, *অনেক সময় নিকট জ্ঞাতি নয়, প্রথমে পার্শ্ববর্তী জমির মালিককে জমি বিক্রি করার সময় জিজ্ঞাস করতে হয়। তিনি মনে করেন, যদিও তিনি নিকট জ্ঞাতি নয়, তারপরও পাশের জমির মালিককে জিজ্ঞাস করা একটা নৈতিক দায়িত্ব। কারণ নিকট জ্ঞাতির কাছে জমি বিক্র করলে সে যদি মানবিক মানুষ না হয়; তাহলে পাশের জমির মালিকের বসবাস করা সমস্যা হবে। তবে জমি ক্রয় করার প্রথম অধিকার নিকট জ্ঞাতির।* অতীতে মালবেদেরা নৌকা তৈরি, প্রথাগত পেশার উপকরণ, চিকিৎসা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে নিকট জ্ঞাতি বা নিজ বংশের লোকজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতো। বর্তমানেও তাদের পরিবর্তিত অনানুষ্ঠানিক পেশার প্রয়োজনে নিকট জ্ঞাতি বা বংশের লোকজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। তবে বর্তমানে দেখা যায় তারা নিকট জ্ঞাতির পাশাপাশি ব্যাংক অথবা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, গবেষিত জনগোষ্ঠীর সেলুনের দোকান,

খাবারের দোকান, মুদি দোকান থেকে নিকট জ্ঞাতিরা সেবা গ্রহণ করেন। তবে অন্য বংশের দোকানে ভালো মানের পণ্য সুলভ মূল্যে পাওয়া গেলে সেখান থেকেও ক্রয় করেন। আবার অনুসন্ধানে দেখা যায়, মালবেদে জনগোষ্ঠীতে যে বংশের লোকসংখ্যা ও সম্পত্তি বেশি; সেই বংশের প্রভাব ও মর্যাদা সমাজে বেশি থাকে। ফলে স্থানীয় নির্বাচনে তাদের বংশ থেকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন: আদিল মেম্বর (সর্দার বংশ), নজরুল মেম্বর (খান বংশ) ও জাহানারা মেম্বর (সর্দার বংশ)। এছাড়া কেউ মৃত্যু বরণ করলে নিকট জ্ঞাতি বা নিজ বংশের লোকের কাছাকাছি কবর দেওয়ার রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতো মালবেদে সমাজেও বিচার-সালিশে স্বজনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কোন সর্দারের নিকট আত্নীয় অথবা বংশের কেউ অপরাধ করলে সালিশে তিনি পক্ষপাত আচরণ করেন। সর্দার অনেক সময় তার আত্নীয়কে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে গুরু দন্ড না দিয়ে লঘু দন্ড দিয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ সময় সর্দার সালিশে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন।

উপসংহার

মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। গবেষিত জনগোষ্ঠীতে বৃহত্তর সমাজের ন্যায় জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদে নিকট জ্ঞাতিরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি নিজ জনগোষ্ঠীর মানুষরাও সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীতে রক্ত (দাদা, চাচা, বাবা তার সন্তান, চাচাতো ভাই-বোন, ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি), বৈবাহিক (স্বামী, ননদ, দেবর, ভাসুর, স্ত্রী,শালা, শালি,শ্বশুর, শাশুড়ি ইত্যাদি) ও কাল্পনিক বা প্রথাগত (ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন, উকিল বাপ, সই, বন্ধু ইত্যাদি) জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতো মালবেদেদের মধ্যে বর্ণনামূলক পদাবলি ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। যেমন-বাবা, মা, চাচা, চাচি, খালা, খালু, মামা, মামি, চাচাতো ভাই-বোন, মামাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন,ফুফাতো ভাই-বোন ইত্যাদি। এছাড়া দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে একরৈখিক বংশধারা তথা পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বিরাজমান। যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বংশধারা ও মর্যাদা পিতা থেকে সন্তানের ওপর স্থানান্তরিত হয়। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার একমাত্র পুত্র সন্তান। এখানে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জ্ঞাতিসম্পর্কের পাশাপাশি মালবেদে জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত মানসিকতা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পরিশেষে বলা যায় দারিদ্র, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, টিকে থাকার প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্কে অনেক সময় শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

Barnouw, V. (1982). *An Introduction to Anthropology*. Ethnology. Homewood: Dorsey Press.

Crapo, R. H. (2002). *Cultural Anthropology*; McGraw Hill; Boston.

Evans-Pritchard, E.E (1940). *The Nuer*: a description of the model of livelihood and political institutes of a Nilotic people. Oxford: At the clarendon press.

Fox, R. (1967*). Kinship and Marriage*, London: Penguin.

Fried, M. H. (1967). *The Evolution of Political Society*. New York: Random House.

Harris, M. (1975). *Culture, Man and Nature*: An Introduction to General Anthropology; 2nd edition New York.

Haviland, W.A. (2018). *Cultural Anthropology* (Nineteenth edition). Harcourt Brace College publishers, New York.

James Birx H. (2010). 21st Century Anthropology. A Reference Handbook. Publisher SAGE Publications, Inc.

Karim, A.H.M. Z. (1990). *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society.* New Delhi: Northern Book Centre, India.

Kottak, C.P. (2004). *Cultural Anthropology* (Tenth edition). The McGraw-Hill companies, Inc. New York.

Levi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. London: Tavistock.

Majumder, D.N. and T.N. Madan (1995). *An Introduction to Social Anthropology*; Asia Publishing House; Bombay.

Miller, Barbara D. (2007). *Cultural Anthropology.(*4th edition). Pearson/ Allyn and Bacon, New Jersey, U.S.A.

Morgan, L.H. (1985) (1871). *Ancient Society*: Researches in the line of human progress from savagery, through barbarism to civilization. Foreword by Elizabeth Tooker. Tucson University of Arizona Press.

Murdock, G. P. (1949). *Social Structure*, New York: Mccmillan.

Nanda, S.; Warms, L.R. (1997). *Cultural Anthropology* (Sixth edition). West/Wadswoth publishing company. New York.

Radcliffe Brown, A.R. (1964). *Structure and Function in Primitive Society*. London: Cohen and West.

Wise, J. (1883*). Notes On the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal*, London, Harrison & Sons.

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস (২০০৩)। *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : সমাজ ও সংস্কৃতি*। একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

কাজল , আনোয়ার (২০২১)। একুশে টিভি.কম।

খান, জয়নাল আবেদীন (২০১১ক)। বেদে, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৯ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১৩)। *সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান*, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা।

বাংলাপিডিয়া (২০১৫)। *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ।* https://bn.banglapedia.org/index.php/।

রহমান, কাজী মিজানুর (২০১৪)। মুন্সিগঞ্জের মালবেদে জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ধারা : একটি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা. *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৮৮)। *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*। হাসান বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০২১)। আগারগাঁও, তালতলা। http://www.dss.gov.bd.